ভিজিটিং আওয়ার্স

দীপা তলাপাত্র

অফিসে কিছুতেই সুস্থির হতে পারছিল না অনিমেষ। সকালে অফিসে আসার পথে হাসপাতালে ঘুরে এসেছে। মঞ্জরী আজ একমাস হ'ল হাসপাতালে ভর্ত্তি। অপারেশনের প'র ধরা পড়েছে কিড্‌নিতে ক্যান্সার। একটা কিডনি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার আগে পর্য্যন্ত ডাক্তাররা একবার মস্তিষ্ক, একবার লিভার বড় হয়েছে—এই সব বলেই চালিয়ে এসেছে। ডাক্তারদের ওপর তাই চরম বিরক্তি অনিমেষের। সব বড় বড় ডিগ্রি সাইনবোর্ডে লিখে ঝুলিয়ে রেখেছে বাহার করে। অথচ, ডায়াগনসিসের বেলায় দ্যাখো। সব টুকে পাশ করেছে। কি ডাক্তার কি মোক্তার। নিজের মনেই গালাগাল দেয় অনিমেষ। আরো আগে যদি ধরা পড়তো তাহলে হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি হতো না। ডাক্তাররা এখন বলছে এখান থেকে ছাড়া পাবার পর ক্যান্সার হস্‌পিটালে চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসা ঠিক মতো হলে ঠিকমতো বাঁচানো যাবে। ঠিকমতো ঠিকমতো চিকিৎসা কি? ঠিকমতো চিকিৎসা? হুঁ, ধরতেই পারে না আবার বড় বড় কথা। চরম বিরক্তি অনিমেষের। Last stage, কি যে করে অনিমেষ। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভাবনাগুলো সব হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। বাড়ীতে মৌ রয়েছে বৃদ্ধা মায়ের কাছে। দুই বছরের এই শিশু। কী যে হবে কিছুই ভাবতে পারে না অনিমেষ। এদিকে কাল বন্‌ধ। আজ সারা অফিস জুড়ে হই-চই। কারা কারা থাকবে রাত্রে অফিসে তারই জল্পনা-কল্পনা। একদলের কথা শুনতে পেল অনিমেষ। ওরা বলছে, "অনিমেষকেও বল রাত্রে থাকার জন্যে। ওই বা থাকবে না কেন?" পরক্ষণেই রজতের গলা শুনতে পায় অনিমেষ। 'এই, না, কেউ ওকে কোন কথা বলবি না। মঞ্জরী আজ একমাস ধরে হাসপাতালে। ওর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ।' সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা বলে উঠ্‌লো, 'তাই তো। অন্যায় হয়ে গিয়েছে আমাদের।' সব কথাই কানে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে পারছে না। 'মঞ্জরী, মঞ্জরী, মঞ্জরী' অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করে অনিমেষ। কি হবে মঞ্জরী? ভগবান, এত বড় শাস্তি কেন তুমি আমায় দিচ্ছ? একবারও ভাবছো না ওই শিশুটার কথা? কাল আবার বন্‌ধ্। কি করা উচিত? হাসপাতালে কি থাকবো? কোনকিছুর যদি দরকার পড়ে তাহলে? কতদূরে শহরতলীতে সে থাকে। হাসপাতাল থেকে বাড়ী যেতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা। আজ হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিলে কেমন হয়? সেই ভাল। ভিজিটিং আওয়ার্সের সময় হয়ে এসেছে। ভিজিটিং আওয়ার্স? সেই ভিজিটিং আওয়ার্স! এক মূহূর্ত্তে মনটা চলে যায় অতীতে। কলেজে পড়ার সময় থেকে মঞ্জরীর সাথে আলাপ। তারপর ঘনিষ্ঠতা। প্রতিটা দিন দুজনে একসঙ্গে বাড়ী ফেরা, মঞ্জরীর টিফিনে ভাগ বসানো। চাকরী পাবার পরও প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় ষ্টেশনে মঞ্জরী অপেক্ষা করতো তার জন্যে খাবার নিয়ে। আর অফিসে বন্ধুরা রাগাতো, 'তাড়াতাড়ি যা, ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়ে গিয়েছে।' মঞ্জরীর একটু দেখা পাবার জন্যে সমস্ত মন, প্রাণ ব্যাকুল হয়ে থাকতো। মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হলেই প্রথমেই মঞ্জরী বলতো, 'তুমি কিছু খেয়েছো? খাও নি তো। চলো, আগে কোথাও বসে খেয়ে নি।' মঞ্জরীও সারাদিন না খেয়ে থাকতো। অপেক্ষা করতো ওর জন্যে। ওকে ফেলে একা একা কিছু খাবে—এ ভাবনাটাই মঞ্জরীর কাছে অসহ্য ছিল। হঠাৎ চমক ভাঙ্গে অনিমেষের। রজত বলছে, 'অনিমেষ, হাসপাতালে যাবে না? ভিজিটিং আওয়ার্স তো মোটে দু'ঘণ্টা রে।' চম্‌কে ওঠে অনিমেষ বলে, 'এই তো যাচ্ছি।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অনিমেষ। একটু দেরী হলেই মঞ্জরী রাগ করবে। অসুস্থ হবার পর থেকেই এটা দেখ্‌ছে। অথচ এই মঞ্জরীই তার জন্যে একদিন না, বছরের পর বছর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে তার জন্যে। আর দূর থেকে অনিমেষ দেখ্‌তো, মঞ্জরীর মুখে চোখে সে কি উৎকণ্ঠা। সে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই মঞ্জরী বলতো, 'উঃ তুমি এসেছ। আমার এতক্ষণ যা চিন্তা হচ্ছিল না। আচ্ছা, পরে সব বলবে, আগে চলো খেয়ে নেবে।' অথচ সেই মঞ্জরী? অনিমেষের এখন মাত্র পাঁচমিনিট দেরী হলেই রেগে টং হয়ে যায়। দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকে। প্রথম প্রথম অনেকেই আসতো হাসপাতালে মঞ্জরীকে দেখতে। এখন একরকম কেউ আসে না বললেই হয়। সেরকম ঘনিষ্ঠ কেউ নেই-ও। মঞ্জরীর বাবা-মার বয়স হয়েছে। থাকেও অনেক দূরে। দাদার কাছে। আসামে। তাই সেরকম আত্মীয় কেউই নেই। গতকাল জ্যামে পড়ে অনিমেষের পৌঁছতে দশমিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল। মঞ্জরী যথারীতি মুখ ঘুরিয়ে। কেবিনে কেউ না থাকায় অনিমেষ জোর করে মঞ্জরীর মুখ ঘুরিয়ে এনে বলে, 'কি ব্যাপার বলোতো? তুমি তো আগে এমন অবুঝ ছিলে না। কত বুঝতে তুমি। এখন তুমি কিচ্ছু বুঝতে চাও না কেন? আমার তো সব দিক একা একাই সামলাতে হয়। এখন তো তুমিও পাশে নেই.....। যেই না বলা, অনিমেষকে চম্‌কে দিয়ে মঞ্জরী তীব্রকণ্ঠে

চীৎকার করে ওঠে, 'কী বললে তুমি? আমি পাশে নেই তোমার? এখনই এই? এখনও তো আমি বেঁচে আছি।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। থতমত খেয়ে অনিমেষ মুহূর্তে সামলে নেয় নিজেকে। তারপর আস্তে আস্তে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'কাঁদে না লক্ষ্মীটি। অমি কি তাই বলেছি? আমি শুধু বলতে চেয়েছি তুমি কাছে নেই বলে আমার কত অসুবিধা হচ্ছে। সবই তো বোঝ তুমি। আর কাঁদে না। কাঁদলে আরও শরীর খারাপ করবে।' কাঁদতে কাঁদতেই মঞ্জরী বলে, 'না, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। আমার এখন মরতে একটুও ইচ্ছা করে না। তোমার জন্যে সারাটাদিন পথ চেয়ে বসে থাকি। একটু দেরী হলে ভয় হয়, চিন্তা হয়। বেশী চিন্তা করলেই আমার বেশী শরীর খারাপ করে। তখন রাগ হয়ে যায়। আমার খুব কষ্ট হয় অনিমেষ, খুব কষ্ট হয়। যখনই ভাবি, আমি বোধহয় আর তোমার কাছে, মৌ-এর কাছে, মায়ের কাছে ফিরতে পারবো না—তখনই বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। আমি তোমাকে ছেড়ে যে থাকতে পারি না।' কেঁদেই চলে মঞ্জরী। আর অনিমেষ? উদ্গাত অশ্রু দমন করে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে বলে, 'কিছু হয়নি তোমার। তুমি ভাল হয়ে যাবে।' 'কেন মিছে সান্ত্বনা দিচ্ছ? আমি তো জানি আমার কি হয়েছে আর বুঝিও সব।' বলতে বলতে উদাস হয়ে যায় মঞ্জরী। তারপর আবার বলে, 'অনিমেষ, আমার প্রথম প্রথম যখন শরীর খারাপ করতো, তখন তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়তে। কত সেবা, কত যত্ন করতে। তারপর তা যখন প্রায়ই নিয়ম করে করতে শুরু করলো, তখন তুমি বিরক্ত হতে শুরু করলে। মনে পড়ে তোমার, একদিন তোমার সঙ্গে একটু রাগারাগি হবার পর তুমি চীৎকার করে উঠেছিলে, 'কেন? কেন শরীর এত খারাপ করবে কেন?' আমি সেদিন তোমার মুখে ওই কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটু পরে আস্তে করে বলেছিলাম, 'আজ থেকে আর করবে না। আর কোনদিন আমি ডাক্তার দেখাতে যাবো না। তোমার মনে আছে অনিমেষ সেই দিনটার কথা?' বলতে বলতে হাঁফাতে থাকে মঞ্জরী। আর অনিমেষ ব্যস্ত হয়ে বলে, 'কেন ওসব কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছ মঞ্জু? বলেছি তো আমার অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা করে দাও।'

—আজ আমায় বলতে দাও অনিমেষ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মঞ্জরী। 'সেই সেদিন থেকে আরেকটা দিনের জন্যেও তোমায় আমি বিরক্ত করিনি। শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি আমায় নিয়ে যেতে। দ্যাখো, ভগবান এখন আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তবু, তবু কেন বলতো এখন এই মূহূর্তে তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না? এতদিন তো তোমায় মুক্তি দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করেছি।'

—আমি জানি না মঞ্জু। তুমি চুপ করো, অনিমেষের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

—আমি তো জানি। আমি জানি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অস্তিত্ব যাবে হারিয়ে। আমি জানি, আমি মারা যাবার পর তুমি আবার বিয়ে করবে। মৌ-এর কথাও ভাববে না। কিন্তু লোককে বলবে, মৌ-এর জন্যেই করা। ওকে কে দেখবে? আমি থাকবো না। অথচ, তিল তিল করে গড়া আমার যে সংসার—সেটা আরেকজন এসে ভোগ করবে।

'মঞ্জু, please চুপ করো। সবাই সমান নয়।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছিল অনিমেষ। আর মঞ্জরী সাপের মত হিস্‌হিস্ করে বলেছিল, 'তবে তুমি সে রাত্রে কেন আমায় অসুখ করে কেন বলে খোঁটা দিয়েছিলে? তুমি খোঁটা না দিলে তো আজ আমার এই অবস্থা হতো না। আমি তো তাহলে নিয়মিত ডাক্তার দেখাতাম, ওষুধ খেতাম। পুরোপুরি ভাল না হলেও আরো অনেকদিন বাঁচতে তো পারতাম। অনিমেষ, তোমায় ভালবেসে উজাড় করে দিয়েছি সব। আর তার বদলে তুমি? তুমি? আমাকে সন্দেহ করেছো, অবিশ্বাস করেছো, আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করেছো।'

—মঞ্জরী প্লিজ্। তুমি চুপ করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে অনিমেষ। চুপ করে যায় মঞ্জরী। এরপর আর কথা হয় না। চলে আসার সময় মঞ্জরীই হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'এই রাগ করো না। আমার যে বড় কষ্ট। সবচেয়ে বড় কষ্ট যে তোমায় ছেড়ে থাকা। আমায় একটু বোঝ। সাবধানে যেও লক্ষ্মীটি।'

—কিরে অনিমেষ, আজ আর হাসপাতালে যাবি না? কি হয়েছে তোর? বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ে রজত তার দিকে। দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল অনিমেষ। মুখ তুলে কোনরকমে 'যাচ্ছি' বলেই শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

হাসপাতালে পৌঁছতে আজ আধঘন্টা দেরীই হয়ে গেল। লিফ্‌টও বন্ধ্। দৌড়ে চারতলায় উঠতে উঠতে ভাবে অনিমেষ, "কি কৈফিয়ৎ দেবে সে আজ মঞ্জরীকে? কাল আবার বন্ধ্। দেখা হবে না। ব্যস্ত হয়ে কেবিনে ঢোকে অনিমেষ। দেখতে পায় মঞ্জরীর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। বুঝতে পারছে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে মঞ্জরীর হাত দুটো চেপে ধরে অনিমেষ বলে, 'আজ আর রাগ করো না লক্ষ্মীটি।'

'আমি রাগ করেছি তোমায় কে বললো? আমার তো বড্ড চিন্তা হচ্ছিল।' স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে মঞ্জরী।

'তুমি রাগ করোনি?' খুশীতে উপছে পড়ে অনিমেষ।

—এই, কাল আর দেখা হবে না, না?' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে

মঞ্জরী।

—মঞ্জু আমি ভাবছি আজ হাসপাতালে থেকেই যাই।

—ওমা, তা কি করে হবে? তোমার কষ্ট হবে, ওদিকে মৌ-এর কষ্ট হবে। কতদিন মৌটাকে দেখিনা। মা, মৌ ভাল আছে তো?

'হ্যাঁ আছে। ওদের কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না।' গল্প করতে করতে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায় না দুজনে। আয়া এসে জানায়, 'ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ। এবার যেতে হবে।' অনিমেষ বলে, "দেখি, ডাক্তারবাবু যদি থাকতে বলেন তো থেকে যাবো। বুঝলে?"

—ঠিক আছে, বলে মাথা ঝাঁকায় মঞ্জরী। তারপর বলে, "আজকাল অনেক.বাজে বাজে কথা বলে তোমায় আমি কষ্ট দিই না, তাই না?' আর তখনই এসে তাড়া লাগায়। 'এখনও যাননি আপনি?'

অনিমেষ, মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত, বিষণ্ণ স্বরে বলে, 'আমি তোমার কষ্ট বুঝি মঞ্জু।' অনিমেষ আর দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। অপেক্ষা করে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'পেশেন্ট তো একইরকম আছে। আপনার আর থাকবার দরকার নেই। যদি প্রয়োজন হয় আমরা খবর দেবো।'

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, কাল যে বন্‌ধ'। ব্যাকুল হয়ে বলে অনিমেষ।

—আমি জানি। কিন্তু আপনি থেকেও তো কিচ্ছু করতে পারবেন না। যদি ফোন থাকে তো নম্বরটা দিয়ে যান। পাশের বাড়ীর ফোন নম্বরটা দিয়ে দেয় অনিমেশ। আর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তারকে বলে, ভিয়ের কিছু নেই তো ডাক্তারবাবু?

'এক কথা কেন বলেন বারবার?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে ডাক্তার। আর অনিমেষ তখন মনে মনে বলে, তুমি কি বুঝবে ডাক্তার? অবশ্য তোমাকেই বা কি দোষ দেবো বলো? তোমরা তো সব যন্ত্র হয়ে গিয়েছো। তাই তো অন্যদের মৃত্যুযন্ত্রণা তোমাদের স্পর্শও করে না। কিন্তু আমরা যারা রোগীরা অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে নিয়ে আসি তখন আমরা তো তোমাদেরই ভগবান বলে মানতে থাকি। আমরা তো যন্ত্র নই আমরা যে মানুষ। তাই তো আমাদের আপনজনের জন্যে এত কষ্ট হয়। তোমাদের এত মেজাজ তাও তো আমরা মুখ বুঁজে সহ্য করি শুধুমাত্র রুগীর কথা ভেবে। কিন্তু ডাক্তার? তোমার নিজের মানুষের যখন এরকম হয় তখনও কি তুমি এমন নির্মম আচরণ করতে পারো? পারো না ডাক্তার পারো না। কেননা তখন তুমি হয়ে যাও অতি সাধারণ মানুষ। সে ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে মাথা নীচু করতে বাধ্য। নিজের মনেই বিড়বিড় করে অনিমেষ। আবার ভাবে, অনেক ভাল ডাক্তারও তো আছে। সবাই তো একইরকম নয়। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে বাড়ী ফেরার পথ ধরে অনিমেষ। বাসে করে ষ্টেশনে আসতেই অনেকটা সময় লেগে গেল। কাল বন্‌ধ। তাই মিটিং মিছিল। দেরী তো হবেই। ট্রেনটাও ছাড়ল বেশ দেরী করে। বসার জায়গা দূরে থাক দাঁড়াবার জায়গাও নেই। কোনরকমে ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে। তা হোক্। তবুও বাড়ীতো পৌঁছনো যাক। আর ভাল লাগছে না। ঝোলার একটা মস্ত সুবিধা এই, নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা তখন করা যায় না। তখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে, অন্য সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। তবুও ঝুলতে ঝুলতেই মনে হ'ল অনিমেষের যখনই মঞ্জরী আর সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো তখনই মঞ্জরী, অনিমেষকে ফুটপাতের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে রাস্তার দিকটা বেছে নিত। যদি অনিমেষের কিছু হয়, যদি গাড়ী চাপা পড়ে। বারবার বাসে-ট্রেনে ওঠার সময় বলতো, 'ঝুলে ঝুলে যাবে না।' এক নিমেষে অনিমেষের বুকটা বড় খালি খালি লাগলো। আজ ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। আর কে তাকে এমনভাবে আগলিয়ে চলবে?

স্টেশনে নামতেই খেয়াল হ'ল, মা বারবার বলে দিয়েছেন, কাল বন্‌ধ। আজ অফিস ফেরতা বাজার করে নিয়ে যেতে। রাতও বেশ হয়ে গিয়েছে। বাজারের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি পা বাড়ায় অনিমেষ। বাজারে আজ অসম্ভব ভীড়। কাল বন্‌ধ। সবাই তাই আজ বাজার করে রাখছে। ভীড়ের মধ্যেই বাজার করতে থাকে অনিমেষ। পাশাপাশি দুটো বাজার। হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে বিকট শব্দ। 'বোমা পড়েছে, বোমা পড়েছে' বলে পাগলের মতো ছুটতে লাগলো সব। নিমেষের মধ্যে শুরু হয়ে গেল লুটপাট। অনিমেষও দৌড়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ মনে হ'ল, সবই তো কেনা হয়েছে আলুটা কেনা বাকী। ব্যস্ত হয়ে অনিমেষ পাশের বাজারে ঢোকে। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে থাকার ফলে অনেক কিছুই নজর এড়িয়ে যায় তার। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলিয়ে নেয় অনিমেষ। কিন্তু মাটির দিকে তাকাতেই তার মুখ দিয়ে বিকট এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তার পা হোঁচট খেয়েছে এক মুণ্ডহীন মহিলার লাশের সঙ্গে। উঃ কী বীভৎস দৃশ্য। মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল সে। পাশ থেকে কে বা কারা তাকে ধরে ফেলে। একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে চোখেমুখে জল দেয় তার। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পায় অনিমেষ। মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন তার জন্যে। কিন্তু মা যে বারবার বলে দিয়েছিলেন আলু নিয়ে যেতে। সেটাই তো হ'ল না। ততক্ষণে সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুলিশে ভর্ত্তি হয়ে

গিয়েছে জায়গাটা। একজন অনিমেষকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান দাদা। কি গণ্ডোগোল বাঁধবে ঠিক আছে কিছু?' সম্বিৎ ফিরে পেতেই বাড়ির দিকে ত্রস্তপদে এগোয় অনিমেষ। ঠিক যা ভেবেছে তাই। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন মৌকে কোলে নিয়ে। তাকে দেখেই দৌড়ে এসে বলেন, 'কি হয়েছে রে অনু? চারিদিকে হৈ চৈ, বোমের আওয়াজ।' 'আর বলো না', ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে অনিমেষ, 'কাল তো বন্‌ধ। তাই আজ বাজারে খুব ভীড়। ঠিক সুযোগ বুঝে কারা বোমচার্জ করে প্রচুর লুটপাট করে নিয়ে গেল।' মা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'একি দেশের অবস্থা হচ্ছে রে? মগের মুলুক নাকি? আর জানি না বাপু, এই বন্‌ধ বন্‌ধ খেলায় কার যে কি লাভ হয়।' 'এটাকে খেলা বলছো কেন মা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অনিমেষ। 'খেলা নয়? অবাক করলি তুই'। ততোধিক অবাক হয়ে মা জবাব দেন, 'তবে নয়তো কি? যখনই একটু সুযোগ পাচ্ছে অমনি সব ডাকছে বন্‌ধ। এই বন্‌ধে আমাদের মতো সাধারণ মানুষগুলোর কি অসুবিধা হয় ভেবে দেখেছে কেউ?' 'ওসব কথা থাক্ মা। খেতে দাও।' অনিমেষের আর ভাল লাগছিল না এই আলোচনা। এমনিতেই নানারকম দুশ্চিন্তায় মনটা ভরে রয়েছে। তার ওপর চোখে ভাসছে বীভৎস দৃশ্যটা। মৌকে একটু আদর করে সোজা বাথরুমে ঢুকে যায় সে।

সারাটা রাত কাটিলো একটা অস্থিরতার মধ্যে। আজ আর মঞ্জুর কাছে যাওয়া যাবে না। যত বেলা বাড়তে লাগলো অস্থিরতাও বাড়তে লাগলো তত। বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে বারান্দায় এল অনিমেষ। এসে দেখে মা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে। 'কি ব্যাপার মা?' 'আর বলিস্ না। ওই দ্যাখ একটা বাচ্চা ছেলে কয়েকটা লেবু নিয়ে বসেছিল।। তা বন্‌ধওলারা ওকে লেবু বেচতে দেবে না। এদিকে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে ওর মায়ের খুব অসুখ। লেবু বিক্রী করতে না পারলে ওর মায়ের জন্যে ওষুধ কিনতে পারবে না। তা ছেলেগুলো শুনছেই না। ঝুড়িটা তো কেড়ে নিয়েছেই। এখন দ্যাখ মারধোর শুরু করেছে।

মায়ের কথা ছাপিয়ে একটা শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ছেলেটা। অন্যরা সব হাওয়া। আশেপাশের কারুর ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না ছেলেটাকে তোলার। 'এরা মানুষ, না পশু'? কাঁপতে কাঁপতে বলেন প্রভাবতী দেবী। 'মা, ভেতরে চল।' একরকম জোর করে টেনেই নিয়ে আসে অনিমেষ। ভেতরে এসেই প্রভাবতী বলেন, 'একী অনাচার। এই যে বন্‌ধওলারা এরা কি কখনও এদের কথা ভাবে? যারা দিন আনে, দিন খায়। তাদের কষ্টের কথা কি ভাবে কেউ? এই যে বাচ্চাটা এ কি বোঝে এসবের? অথচ, মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে এখন।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন প্রভাবতী। ঠিক এই সময়ে পাশের বাড়ী কাজের ছেলেটা এসে জানায় অনিমেষের ফোন এসেছে। নিমেষে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায় অনিমেষের। এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে বুকের ভিতরটা। দৌড়ে যেতে গিয়েও পারে না, পা দুটো অসম্ভব ভারী। উঠতেই চাইছে না। কোনরকমে পা টেনে টেনে নিয়ে ফোন ধরে অনিমেষ। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে 'হ্যালো' বলতে না বলতেই ওপার থেকে শোনা যায়, 'হ্যালো অনিমেষবাবু শুনছেন? আপনার স্ত্রীর অবস্থা হঠাৎই খারাপ হয়েছে। এক্ষুণি এখানে চলে আসুন। কিছু ওষুধের দরকার।' 'কিন্তু আমি যাবো কি করে? আজ তো বন্‌ধ। আর আমার বাড়ী কতদূরে বলুন তো? এই জন্যেই কাল আমি হাসপাতালে থাকবার কথা বলেছিলাম। ডাক্তারবাবু না করলেন। এখন আমি কি করি'? 'সে আপনার ব্যাপার আপনি বুঝবেন। আমার জানানোর দরকার আমি জানালাম।' সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শোনে অনিমেষ। এখন কি হবে? কিছু ভাবতে না পেরে মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়ে অনিমেষ। অনিমেষকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ওই বাড়ীরই ছেলে সুশান্ত এসে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে অনিমেষদা? কোন খারাপ খবর?' 'আর বোলো না সুশান্ত। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল মঞ্জুর অবস্থা খুব খারাপ। আমার এখনই যাওয়া দরকার। কিন্তু যাই কি করে বলতো'? 'তাই তো' চিন্তিত স্বরে বলে সুশান্ত। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'চলুন অনিমেষদা মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে দেখি, অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় কিনা?' 'তাই চলো ভাই'। মিউনিসিপ্যালিটিতেও এসে দেখে সেখানেও একই অবস্থা। একটাই অ্যাম্বুলেন্স। সেটাও বেরিয়ে গিয়েছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

আর পারে না অনিমেষ। 'কি হবে সুশান্ত'? বলেই কেঁদে ফেলে। 'চলুন বাড়ীতে তো যাই। আপনি স্নান খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর দেখি ফোনে লাইন পাই কিনা।' 'আগেই দ্যাখো না ভাই। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।' 'আচ্ছা, একবার দেখি।'

বাড়ী ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। সুশান্তর বাড়ী এসে জানতে পারে সুশান্তর বাড়ীতে আবার ফোন এসেছিল। সুশান্ত পাগলের মতো চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু না, লাইন আর পাওয়া যায় না। 'আমি দেখছি, আপনি খাওয়া দাওয়া করুন গিয়ে।' একরকম জোর করেই অনিমেষকে পাঠিয়ে দেয় সুশান্ত।

অনিমেষের মুখ দেখেই টের পায় প্রভাবতী। কিছু একটা হয়েছে। ভয়ে প্রশ্ন করতে পারেন না। 'বাবা, বাবা' করতে করতে

দৌড়ে আসে মৌ। শিশুটাকে কোলে নিতে পারে না সে। সজল চোখে একবার তাকিয়েই বাথরুমে গিয়ে ঢুকে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'হাত দিয়ে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে থাকে। বন্‌ধ বন্‌ধ বন্‌ধ। পাগল করে দেবে। ওই দিকে মঞ্জুর যে হৃদ্‌কম্পন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে? চীৎকার করে বন্‌ধওলাদের ডেকে বলতে ইচ্ছা করে, 'ভাই, তোমাদের কাছে যেটা খেলা, সেটা যে আমাদের কাছে মৃত্যু। তোমরা তো ডেকেই খালাস্। কিন্তু দুর্ভোগ তো ভুগছি আমরা। তোমাদের এতে কিছু লাভ হলেও আমাদের তো তার কিছুই এসে যাবে না'। পাগলের মতো নিজের কপালেই করাঘাত করতে থাকে অনিমেষ। এই সময়ই শুনতে পায় সুশান্তর গলা, 'মাসীমা অনিমেষদা কোথায়? ফোন এসেছে।' দৌড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ছুটে যায় অনিমেষ। 'হ্যালো, কি বলছেন? অবস্থা আরো খারাপ? দ্বিতীয় বার অপারেশনের জন্যে O.T.-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? Please শুনুন। একটু দয়া করুন। আপনাদের stock-এ যে ওষুধ আছে তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন, পরে আমি গিয়ে দিয়ে দেবো। কি বলছেন? আপনাদের স্টকে এ ওষুধ নেই? তাহলে আমি কি করবো? কোথায় গেল বন্‌ধওয়ালারা। আসুক, দেখি, সাহায্য করুক আমায়। পাগলের মতো চীৎকার করতে থাকে অনিমেষ। 'অনিমেষদা আপনি স্থির হোন্। আমি দেখ্‌ছি কি করতে পারি।' 'কি আর করবে সুশান্ত? কারুর গাড়ী দেবে না আগুন লাগিয়ে দেবার ভয়ে।' 'আমি দেখ্‌ছি। চলুন। আপনি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমি ব্যবস্থা করতে পারলেই চলে আসবো।' অনিমেষকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে যায় সুশান্ত। মঞ্জু বৌদি যে তাকেও খুব ভালবাসতো। সেই বৌদি বাঁচবে না?

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনিমেষ। নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছে। প্রভাবতীও ব্যাপারটা আঁচ করে মৌকে নিয়ে পাশের ঘরে সরে গিয়েছেন। সেখান থেকে মাঝে মাঝে কান্না চাপার ব্যর্থ প্রয়াস কানে আসছে অনিমেষের। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সুশান্ত এখনও ফিরল না। রাত দশটা। সুশান্তর গলা, 'অনিমেষদা আসুন। অতি কষ্টে অ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করেছি। চলুন।' কোনরকমে 'মা যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে আসে অনিমেষ। মনে মনে ভাবে, এই বন্‌ধওয়ালাদের কি তিনি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন? এরা তো জহ্লাদ। এরাই তার মঞ্জুকে মেরেছে। এদের জন্যেই তিনি হাসপাতালে পৌঁছাতো পারলেন না। ওষুধ দিতে পারলেন না। কই, এখন তো একজনও তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। অথচ, এরাই না মাইকে করে বলে বেরিয়েছে, আপনারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করুন। আমাদের বন্‌ধ সফল করুন। আপনাদের একান্ত সহযোগিতা আমাদের প্রার্থনীয়। অনেকক্ষণ পর অনিমেষ বলে, 'সুশান্ত, ওই বন্‌ধওয়ালা কোথায় গেল বলতো'? সুশান্ত কিছু বলে না। গাড়ী ছুটে চলে। রাত বারোটার সময় গাড়ী এসে পৌঁছয় হাসপাতাল চত্বরে। নিমেষে মনে হয় অনিমেষের, এখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। কথাটা আস্তে করে সুশান্তকে বলতেই সুশান্ত ম্লান হেসে বলে, 'অনিমেষদা আসুন।' এগিয়ে চলে সুশান্ত আর তার বন্ধুরা। ক্লান্ত, বিষণ্ণ পায়ে ভয়ে ভয়ে অনিমেষও চলতে থাকে। বেশী খোঁজ করতে হয় না। ডাক্তারের দেখা পেয়ে যায় অনিমেষ। ওকে দেখেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'সরি, অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল। তবে ঠিক সময়ে ওই ওষুধগুলো যদি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো বাঁচানো যেতো।' তার মঞ্জু আর নেই। আর কোনদিনও ভিজিটিং আওয়ার্সের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে না। মঞ্জু বড় অভিমানে চলে গেল সুশান্ত, বড় অবহেলায় চলে গেল। অনিমেষের কানে কিছুই ঢুকছিল না। শুধু কানে বাজছিল মঞ্জুর কথাটা, 'আমার একটুও মরতে ইচ্ছে করে না। আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাই।' 'আমি পারলাম না মঞ্জু, পারলাম না, হেরে গেলাম'। নিজের মনেই বিড়বিড় করে অনিমেষ।

'কিন্তু কি হয়েছিল'? জানতে চায় সুশান্ত। ডাক্তারবাবু বলেন, 'কোনও লিকেজ থাকার জন্যে পেটে ফ্লুইড জমা হয়ে যাচ্ছিল ও ভেতরে সেলাই খুলে গিয়েছিল, জ্ঞান হবার পর রোগিণীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ৯-৩০মিঃ-এ উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

নিমেশের মধ্যে সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে ওই বন্‌ধওলাদের ওপর। ওই ওদের জন্যেই তো তার নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে আসা হ'ল না। ওদের জন্যেই তো মঞ্জু বিনা ওষুধে মারা গেল। ওই ওদের জন্যেই তো মঞ্জুকে শেষ দেখাটুকু পর্য্যন্ত সে দেখ্‌তে পেল না। এগুলি কি কখনো বুঝবে ওই মানুষগুলো? বুঝবে না, বুঝবে না। তারই মতো এভাবেই কত মঞ্জরীকে হারাবে কে ওর হিসাব রাখবে?